খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক এর ১৩ই মার্চ, ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর সবসময় দৃঢ় আস্থা থাকা চাই যে, কুরআন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামাতে আহমদীয়ার সাথে আছে আর কুরআনের সমর্থনই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নেক লোকদের বক্ষকে জ্যোতির্মন্ডিত করে জামাতের মান্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে। এর মাধ্যমে অনেক শিক্ষণীয় কথা সামনে আসে যার মাধ্যমে আজও আমাদের গন্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা পথের দিশা পাই।

প্রথম ঘটনা বা বর্ণনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তবলীগের প্রতি আন্তরিকতা, আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের সাথে সম্পর্ক রাখে যে, তিনি এ ক্ষেত্রে জামাতকে কেমন দেখতে চেয়েছেন। ইসলামের তবলীগের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে যে আবেগ, যে আন্তরিকতা, যে বেদনা ছিল এবং তিনি জামাতের সদস্যদের মাঝেও যার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে জামাতের তবলীগের জন্য অভিনব সব চিন্তাধারা উদয় হতো এবং দিবা-রাত্র তিনি এ চিন্তাতেই মগ্ন থাকতেন যে, এই পয়গাম যেন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যায়। একবার তিনি এ প্রস্তাব করেন যে, আমাদের জামাতের পোশাকই ভিন্ন হওয়া উচিত যেন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই এক জীবন্ত তবলীগ হিসেবে কাজ করে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাবাবলী সামনে আসে। অর্থাৎ যেন চিনা যায় যে, এ ব্যক্তি আহমদী। নিছক স্বতন্ত্র পরিচিতি কোন অর্থ রাখে না। নিশ্চয় তার বাসনা এটিই ছিল যে, এভাবে সবার এক পোশাক দেখে আর সেই সাথে কর্ম এবং উন্নত বিশ্বাস দেখে একদিকে যেখানে অ-আহমদীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে সেখানে অপরদিকে নিজেদের মাঝেও এ সচেতনতা বিরাজ করবে যে, আমি একজন আহমদী হিসেবে পরিচিত হব তাই আমাকে আমার কর্ম এবং বিশ্বাসের মানকে উন্নত এবং সঠিকও রাখতে হবে।

অতএব আজও আমাদের মাঝে এ সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন যে, পোশাক হয়তো তেমন বড় কোন জিনিস নয় কিন্তু কমপক্ষে আমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, আমাদেরকে দেখে যেন মানুষ চিনতে পারে যে, এ ব্যক্তি আহমদী এবং অন্যদের চেয়ে সে স্বতন্ত্র। পোশাকের কথা হচ্ছিল, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ভাষ্যমতে একজন মুবাল্লেগ বা ধর্মের সেবকের চেহারা কেমন হওয়া উচিত। তিনি বলেন, তবলীগের জন্য এটি আবশ্যক যেন একজন মুবাল্লেগের চেহারা মু'মিন সুলভ হয়। খোদ্দামুল আহমদীয়াকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তাই আমি খোদ্দামুল আহমদীয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, তাদের বাহ্যিক চেহারা সুরত ইসলামি শিক্ষা সম্মত হওয়া উচিত এবং তাদের দাড়ি, চুল ও পোষাকে অনাড়ম্বরতা থাকা চাই। ইসলাম তোমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানে বারণ করে না। পোশাক পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত, পরিষ্কার হওয়া উচিত। এটি থেকে ইসলাম বারণ করে না বরং ইসলাম নিজেই নির্দেশ দেয় যে, তোমরা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সচেতন থাকবে এবং নোংরামীর কাছেও যাবে না কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদে কৃত্রিমতার পন্থা অবলম্বন করা নিষেধ।

তবলীগের প্রেক্ষাপটে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, তবলীগের ওপর বা তবলীগের প্রতি বিশেষ ভাবে গুরুত্বারোপ করা উচিত। একবার তিনি দিল্লী যান এবং বলেন যে, এবার দিল্লীতে আমার এক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা হয়েছে। দিল্লীবাসীরা এখন বক্র বিতর্ক করা ছেড়ে দিয়েছে নতুবা পূর্বে যখনই এখানে আসার সুযোগ হয়েছে দিল্লীর সকল প্রকার মানুষ আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসত আর অদ্ভুত সব বিতর্ক আরম্ভ করে দিত আর কেউ কোনদিন কোন যুক্তিপূর্ণ বা যুক্তিযুক্ত কথা বলেনি। তিনি বলেন, আমার মনে আছে তখন আমি ছোট ছিলাম। আমি এখানে আসি এবং আমার আত্মীয়-স্বজনের ঘরেই অবস্থান করছিলাম। হায়দারাবাদের আমাদের আত্মীয় সম্পর্কের এক ভাই আমাদের সেই সম্পর্কের নানির কাছে এসেছিলেন যার কাছে হযরত আম্মাজান অবস্থান করছিলেন। সম্পর্কের সেই ভাই আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, এই ছেলে কে? আমার নানি বলেন যে, অমুকের ছেলে অর্থাৎ হযরত আম্মাজানের নাম নিয়ে তিনি বলেন। হযরত আম্মাজানের নাম শুনে তিনি আমাকে বলে যে, তোমার পিতা কি হট্টগোল সৃষ্টি করে রেখেছে, মানুষ বলে তোমার পিতা নাকি ইসলামের বিরুদ্ধে অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, যদিও তখন আমার বয়স কম ছিল কিন্তু ভয় পাওয়ার পরিবর্তে যেহেতু হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত যুক্তি আমার খুব ভালভাবে জানা ছিল তাই আমি ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলা আরম্ভ করি। আমি বলি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শুধু একথা বলেন যে, ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন আর এ যুগে যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহ্দীর আসার কথা তিনি এই উম্মত থেকেই আসবেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, কুরআনের সেই সব আয়াত যা দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হয়, তা থেকে **"ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্ফীকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া"** আয়াতটি মুখস্থ ছিল, তাই আমি এই আয়াত সংক্রান্ত পুরো বিষয় খোলাসা করে বর্ননা করি। তখন তিনি আশ্চর্য

হয়ে বলেন যে, সত্যিই এই আয়াত থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু এই সমস্ত মৌলভীরা কেন হৈ চৈ করে? তখন আমি বললাম যে, একথা আপনি মৌলভীদেরকেই জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু এতে নানির প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল দেখুন। তিনি (রা.) বলেন, আমার নানি হট্টগোল বা হৈ চৈ আরম্ভ করে যে, তওবা কর, তওবা কর। এই বাচ্চার মাথা পূর্বেই এই কথাগুলো শুনে বিকারগ্রস্থ তুমি তার সত্যায়ন করে এই কুফরিতে তাকে পোক্ত করে দিয়েছ।

এরপর তবলীগের প্রেক্ষাপটে তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.)-এর এক সাহাবীর তবলীগের রীতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, মিঞা শের মুহাম্মদ সাহেব একজন নিরক্ষর মানুষ ছিলেন। এক্কা বা টমটম গাড়ী চালাতেন। তার রীতি ছিল এই যে, যাত্রীকে এক্কা বা টমটম গাড়ীতে বসাতেন আর টমটম চালনা অব্যাহত রেখে যাত্রীর সাথে গল্প করা আরম্ভ করতেন। আল-হাকাম পত্রিকা সাথে রাখতেন। পকেট থেকে পত্রিকা বের করে যাত্রীদের জিজ্ঞেস করতেন যে, আপনাদের মাঝে কেউ পড়ালেখা জানে কিনা। কোন পড়ালেখা জানা ব্যক্তি থাকলে তাকে বলতেন যে, আমার নামে এই পত্রিকা এসেছে, আমাকে এই পত্রিকাটি একটু পড়ে শুনান। পত্রিকা পাঠ করা আরম্ভ হলেই তিনি প্রশ্ন করা আরম্ভ করতেন যে, এটি আবার কি লেখা হলো, এই কথার অর্থটা কি। মিঞাঁ শের মুহাম্মদ সাহেব এমনটি করতেন আর এমন ভাবে প্রশ্ন করতেন যে, অ-আহমদী পাঠককে চিন্তা করে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো আর এভাবে কথা ভালোভাবে তার হৃদয়ঙ্গম হয়ে যেত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এই ঘটনা যখন তিনি আমাকে শুনিয়েছেন তখন পর্যন্ত তার মাধ্যমে ডজনের অধিক মানুষ আহমদীয়াত গ্রহন করেছে। আর এটি শুধু আল-ফযল বা আল-হাকাম পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে। এরপরও দীর্ঘদিন তিনি জীবিত ছিলেন। জানিনা এভাবে আরও কতজন মানুষ তার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। এককথায় কাজ আরম্ভ করার জন্য আমাদের বড় বড় আলেম হস্তগত হওয়া আবশ্যক নয়। আলেমদের যেহেতু ধর্মের সূক্ষ্মতায় প্রবেশ করতে হয় তাই তাদের জ্ঞান অর্জন করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় কিন্তু যদিও ধর্মে অনেক সূক্ষ্ম দিক রয়েছে এবং তা শিখার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, এই বাস্তবতা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) বলেছেন, **"আদ্‌দীনু ইউসরুন"** অর্থাৎ ধর্ম সহজ সাধ্যতার নাম।

তাই তবলীগের জন্য জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক বা বড় বড় সেমিনার এবং ফাংশনের ওপর নির্ভর করা আবশ্যক নয়। পরিস্থিতি অনুসারে রীতি অবলম্বন করা উচিত। এযুগেও এমন অনেক আহমদী আছে যারা ব্যক্তিগত ভাবে তবলীগের বিভিন্ন রীতি উদ্ভাবন করেন এবং আল্লাহ্‌র ফযলে তারা অনেক সফল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেবের এক কমন বন্ধুর একটি ঘটনা তিনি (রা.) বর্ণনা করেন। তার নাম ছিল নিযামুদ্দীন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী করেন আর মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী তার বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া দেয় তখন তিনি গভীর মর্মপীড়ায় ভুগেন কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুন্য এবং নেকীর ওপর তার গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি লুধিয়ানায় থাকতেন। বিরোধীরা যখনই হযরত মসীহ্ মওউদের বিরুদ্ধে কিছু বলত তিনি তাদের সাথে ঝগড়া করতেন। তিনি বলতেন যে, প্রথমে গিয়ে মির্যা সাহেবের অবস্থা খতিয়ে দেখ। তিনি বড় উন্নত মানের নেক মানুষ। আমি তার কাছে অবস্থান করে দেখেছি। যদি তাকে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কুরআন থেকে কিছু বুঝিয়ে দেয়া হয় তাহলে তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে তা গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি আদৌ প্রতারণা করেন না। যদি কুরআন থেকে তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, তার দাবী ভ্রান্ত তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে তা মেনে নেবেন। আমি ভালো ভাবে জানি যে, তিনি কুরআনের কথা শুনে কোন উচ্চবাচ্য করেন না। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে একদিন তিনি লুধিয়ানা থেকে কাদিয়ান আসেন। আর এসেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন যে, আপনি কি ইসলাম ছেড়ে দিয়েছেন? কুরআনকে অস্বীকার করে বসেছেন?হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এটি কিভাবে হতে পারে বা এটি কিভাবে সম্ভব! আমি কুরআন মানি আর ইসলাম হলো আমার ধর্ম। তিনি বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমি এটিই মানুষকে বলে বেড়াই যে, তিনি কুরআনকে কোন ভাবেই পরিত্যাগ করতে পারেন না। এরপর তিনি বলেন যে, আচ্ছা আমি যদি কুরআন শরীফ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত আকাশে যাওয়া সম্পর্কে শত শত আয়াত উপস্থাপন করি তাহলে আপনি কি তা গ্রহন করবেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, শত শত আয়াত তো দূরের কথা আপনি যদি একটি আয়াতও এমন দেখাতে পারেন তাহলেই আমি মেনে নেব। তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ আমি মানুষের সাথে এই বিতর্কই করে আসছি যে, হযরত মির্যা সাহেবকে মানানো কঠিন কিছু নয়। মানুষ অনর্থক হৈ চৈ করছে।

এরপর তিনি বলেন যে, আচ্ছা শত শত না থাকলেও যদি আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিষয়ে একশত আয়াতই উপস্থাপন করি আপনি কি মানবেন? তিনি (আ.) বলেন, আমি তো পূর্বেই বলেছি আপনি যদি এমন একটি আয়াতও উপস্থাপন করেন আমি মেনে নেব। যেভাবে কুরআনের একশত আয়াত মানা আবশ্যক অনুরূপ ভাবে কুরআনের এক একটি শব্দও মানা আবশ্যক। একটি বা একশত আয়াতের প্রশ্নই নয়। তিনি বলেন যে, আচ্ছা একশত না হলেও যদি পঞ্চাশটি আয়াত উপস্থাপন করি তাহলে আপনি নিজের দাবী পরিত্যাগ করার কথা রাখবেন কি? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, আমি তো পূর্বেই বলেছি আপনি একটি আয়াত হলেও উপস্থাপন করুন আমি তা মানার জন্য প্রস্তুত আছি। এ বিষয়ে ক্রমাগত ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃঢ়তা প্রকাশ পেতে দেখে তার সন্দেহ জাগে যে, কুরআন করীমে হয়ত এই বিষয়ে এত আয়াত নেই। পরিশেষে তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে আমি যদি দশটি আয়াত উপস্থাপন করি তাহলেও কি আপনি মানবেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হেসে ফেলেন এবং বলেন যে, আমি তো আমার পূর্বের কথার

ওপরই প্রতিষ্ঠিত আছি আপনি এ বিষয় সংক্রান্ত একটি আয়াতই উপস্থাপন করুন। তিনি বলেন, আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি, চার পাঁচ দিনের ভিতর ফিরে আসব আর কুরআন থেকে এমন আয়াত আমি আপনাকে অবশ্যই দেখাব।

সেই দিন গুলোতে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী লাহোরে অবস্থান করছিলেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও সেখানেই ছিলেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সাথে বির্তকের জন্য শর্ত নির্ধারিত হচ্ছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী একথা বলতেন যে, কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হলো হাদীস। তাই কোন কথা যদি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় তাহলে তা কুরআনের কথা বলেই গণ্য হবে। তাই হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন মৃত্যু সম্পর্কে হাদীসের আলোকেই বির্তক হওয়া উচিত আর হযরত মৌলভী সাহেব বলছেন অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলছেন, কুরআন হাদীসের ওপর অগ্রগণ্য তাই কুরআন থেকেই নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রমাণ করতে হবে। এটি নিয়ে বেশ কিছুদিন বিতর্ক চলতে থাকে। সেই সময় মিঞা নিজামুদ্দীন সাহেব সেখানে পৌঁছেন এবং বলেন যে, সব বিতর্ক বন্ধ কর। আমি হযরত মির্যা সাহেবের সাথে দেখা করে এসেছি। তিনি এখন তওবা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। আমি তার কাছে গিয়েছি এবং এই ওয়াদা নিয়ে এসেছি যে, কুরআন থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে যাওয়া সংক্রান্ত দশটি আয়াত যদি দেখিয়ে দেয়া হয় তাহলে তিনি ইসা (আ.)-এর জীবিত থাকার কথা মেনে নিবেন। আপনি এমন দশটি আয়াত আমাকে দেখিয়ে দিন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী খুব রাগী মানুষ ছিলেন এবং ত্বরাপরায়ণ ছিলেন। তিনি বলেন যে, দূর্ভাগা! তুই আমার সব কাজ পণ্ড করে দিয়েছিস। আমি দুই মাস যাবত তর্ক করে তাকে হাদীসের দিকে নিয়ে এসেছিলাম তুই আবার কুরআনের দিকে নিয়ে গেছিস। মিঞা নিজামুদ্দীন সাহেব বলেন যে, আচ্ছা দশটি আয়াতও তাহলে আপনার সমর্থনে নেই। সে বলে যে, তুই অজ্ঞ তুই কি জানিস কুরআনের কথার অর্থ কি। তিনি বলেন যে, আচ্ছা তাহলে কুরআন যে দিকে আছে আমিও সে দিকে আছি। একথা বলে তিনি কাদিয়ানে আসেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেন। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর সবসময় দৃঢ় আস্থা থাকা চাই যে, কুরআন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামাতে আহমদীয়ার সাথে আছে আর কুরআনের সমর্থনই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নেক লোকদের বক্ষকে জ্যোতির্মন্ডিত করে জামাতের মান্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

এরপর তিনি এই কথার ব্যাখ্যা করে বলেন, বিরোধীতাও হেদায়াতের কারণ হয়ে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, বিরোধীতা যখন বেড়ে যায় তখন জামাতও উন্নতি করে। আর বিরোধীতা যখন বৃদ্ধি পায় খোদার নিদর্শন সূচক সমর্থন এবং সাহায্যের মাত্রাও তখন বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যখন কোন বন্ধু এ কথা বলতেন যে, আমাদের এলাকায় ভয়াবহ বিরোধীতা হচ্ছে তিনি (আ.) বলতেন যে, এটি তোমাতের উন্নতির লক্ষণ। যেখানে বিরোধীতা হয় সেখানে জামাতও বৃদ্ধি পায়। বিরোধীতার ফলশ্রুতিতে অনেক অনবহিত ব্যক্তি জামাত সম্পর্কে অবহিত হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়ে জামাতের সহিত্য পড়ার আগ্রহ জাগে আর জামাতের বই পুস্তক পড়ার ফলে সত্য তাদের হৃদয়কে জয় করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আহমদী হওয়ার পর এক নিরক্ষর ব্যক্তিকেও আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে বিবেক বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ করেন আর সে উপস্থিত উত্তর দিতে পারে এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) বলেন যে, লুধিয়ানা অঞ্চলের মিঞা নূর মুহাম্মদ সাহেব নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমাজের নীচু শ্রেণী বা অবহেলিত শ্রেণীর মাঝে তবলীগের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে রেখেছিলেন। শত শত এমন ঝাড়ুদার তার শিষ্যত্ব বরণ করে নিয়েছিল। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনেন এবং তার কোন কোন মুরীদ অনেক সময় এখানেও এসে যেত কেননা তারা মনে করত যে, হযরত মির্যা সাহেব আমাদের পীরেরও পীর। এখানে আমাদের এক সম্পর্কের চাচা নিছক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীতা এবং তার দাবীকে হাসি ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করার জন্য এই দাবী করে রেখেছিল যে, আমি মেথরদের পীর। তিনি আর কিছু তো করতে পারেননি কিন্তু মেথরদের পীর হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেন আর তার দাবী ছিল যে, আমি হলাম লাল বেগ অর্থাৎ মেথরদের নেতা। একবার এমন কিছু মানুষ যারা মেথরদের ভিতর থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল এখানে আসে। তাদের হুক্কা পান করার অভ্যাস ছিল। যে ব্যক্তি মেথরদের নেতা হওয়ার দাবী করত বা পীর হওয়ার দাবী করত, এমনিতে তো সে মোগল ছিল। তার বৈঠকে তারা যখন হুক্কা দেখে তো হুক্কার খাতিরে তারা সেখানে গিয়ে বসে পড়ে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমাদের এই সম্পর্কের চাচা তাদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন আর বলেন যে, তোমরা মির্যা সাহেবের কাছে কেন এসেছ? তোমারা তো সত্যিকার অর্থে আমার মুরীদ বা শিষ্য। মির্যা সাহেব তোমাদের কী দিয়েছেন? তারা নিরক্ষর ছিল। যেভাবে মেথররা সচরাচর হয়ে থাকে। তারা উত্তরে বলে, আমরা বেশী কিছু জানি না। কিন্তু এতটা আমরা অবশ্যই বুঝি যে, মানুষ পূর্বে আমাদেরকে চূড়া বা মেথর বলত কিন্তু মির্যা সাহেবের সাথে সম্পর্কের কারণে এখন আমাদেরকে মির্যায়ী বলে। অর্থাৎ আমরা মেথর ছিলাম, তার কল্যাণে এখন আমরা মির্যা হয়ে গেছি। কিন্তু আপনি পূর্বে মির্যা ছিলেন আর মির্যা সাহেবের বিরোধীতার কারণে এখন মেথর হয়ে গেছেন।

মৌলভীরা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে যে ভুল ধারনা সৃষ্টি করে রেখেছে যে, ঈসা (আ.) নিজ হাতে পাখি বানাতেন, এরপর তাদের মাঝে প্রাণ ফুৎকার করতেন বা সঞ্চার করতেন আর সেই পাখি সাধারণ পাখির মত উড়া আরম্ভ করতো। এটি কুরআন না বুঝার কারণে, এর কারণ হল কুরআন না বুঝা। এর একমাত্র অর্থ হল আধ্যাত্মিক যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের তিনি প্রশিক্ষন দিয়ে খোদার দিকে আধ্যাত্মিক অর্থে উড়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করতেন। যাহোক এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মৌলভী একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আলোচনা করছিল বা কথা বলছিল। তিনি (রা.) লিখেন যে, একবার এক মৌলভী জিজ্ঞেস করে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)

একবার এক মৌলভীকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনারা তো বলেন ঈসা (আ.) পাখি বানাতেন, প্রশ্ন হল আজকে পৃথিবীতে আমরা যত পাখিই দেখি সেগুলোর কতক তাহলে আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট হবে আর কতক ঈসা (আ.)-এর। এখন এই উভয় প্রকার পাখির মাঝে আপনি কি কোন পার্থক্য দেখাতে পারেন যার মাধ্যমে এটি বুঝা যাবে যে, কোনটি মসীহ্র সৃষ্ট আর কোনটি আল্লাহ্র সৃষ্ট। তখন সেই মৌলভী বলে যে, এটি তো কঠিন ব্যপার কেননা আল্লাহ্র সৃষ্ট এবং ঈসা (আ.)-এর সৃষ্ট পাখি এখন মিলেমিশে গেছে। এখন উভয় প্রকার পাখির মাঝে পার্থক্য করা কঠিন।

আমাদের সবসময় এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি কোন আইডিওলজিকাল বা দৃষ্টিভঙ্গিগত বিশ্বাস নয় বরং তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পৃথিবীতে এসে খোদার একত্ববাদই প্রতিষ্ঠিত করার ছিল। এই বিষয়টি ইসলামের ভয়াবহ ক্ষতি করেছে আর আমরা যতক্ষণ এটিকে পিষ্ট না করব স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারি না। অনেকে অনেক সময় বলে যে, এটি তো তেমন কোন বিষয় নয় কিন্তু আসল কথা হলো এটি একত্ববাদের পথে বাঁধা যা দূরীভূত করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে এত গভীর উচ্ছাস এবং জোশ ছিল। আর এটিই সেই জোশ ছিল যা খোদা তা'লার কৃপারাজীকে আকৃষ্ট করেছে এবং সত্যের ভিত রচনা করেছে। আর আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যে ইসলামকে ভালবাসে সে বুঝতে পারে যে, এটি সেই অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে বিরাজমান ছিল। যদি কেউ অনুভব করে যে, তার হৃদয়ে খোদার ভালবাসা এবং ইসলামের তবলীগের একাগ্রতা রয়েছে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এটি সেই অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে ছিল।

সুতরাং আমাদের সমূহ প্রচেষ্টা এই কথাকে কেন্দ্র করে হওয়া উচিত এবং এর মাঝে আবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু আমরা যদি এ কথাকে না বুঝি তাহলে আমরা যে কাজই করি না কেন তা বাহ্যত তৌহীদ বা একত্ববাদ মনে হলেও এটি আসলে কোন শিরকের পূর্ব লক্ষণ হবে। এটি তৌহীদও আবার শিরকেরও লক্ষণ এটি কীভাবে সম্ভব? এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্মওউদ (রা.) একটি ঘটনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এক ব্যক্তি এখানে অধ্যয়ন বা পড়ালেখা করতেন। তিনি প্রতিদিন এই বিতর্ক করতেন যে, মহানবী (সা.) আলেমুল গায়েব বা অদৃশ্যে জ্ঞাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার মাথায় রূমী টুপি ছিল। একদিন এক ব্যক্তি তাকে ডাকে এবং বলে, তুমি কি মনে কর যে, রসূলে করীম (সা.) এটি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তখন সেই ব্যক্তি নির্লজ্জের মত বলে বসে, হ্যাঁ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এখন এটি জেনে গেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এর কারণ হলো মানুষ ওয়াহ্দানীয়াত বা একত্ববাদ পর্যন্ত যায় কিন্তু একক হওয়া বা আহাদীয়াত পর্যন্ত পৌঁছে না। এখানে বুঝার জন্য দু'টি বিষয় রয়েছে, ওয়াহ্দানীয়াত এবং আহাদীয়াত। অর্থাৎ তারা ওয়াহ্দানীয়াত পর্যন্ত তো যায় কিন্তু আহাদীয়াত পর্যন্ত পৌঁছায় না যেখানে পৌঁছানোর পর জানা যায় যে, যদিও মানুষও এক ধরণের স্রষ্টা, রিযিকদাতা কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তা'লা ভিন্ন আর সৃষ্টি ভিন্ন। সত্তার ক্ষেত্রে উভয়ে কখনও একাকার নয় আর না হতে পারে অর্থাৎ উভয়েই কখনও একাকার হতে পারে না।

ওয়াহেদ এবং আহাদ-এর অর্থ অভিধান এর দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা ব্যাখ্যা তুলে ধরছি যেন বুঝা সহজ হয়। আল্লাহ্ তা'লা ওয়াহেদও এবং আহাদও। ওয়াহ্দানীয়াত এর অর্থ হলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি এক বা একক। আর আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য কিছুটা হলেও মানুষের সত্তায় প্রতিফলিত হয়। আর এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত বা সর্বোত্তম প্রতিফলন যা কোন মানুষের মাঝে হতে পারে তা হয়েছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সত্তায়। কিন্তু গুণাবলীর ক্ষেত্রে কামেল বা পরমোৎকর্ষ হলো একমাত্র খোদরই সত্তা।

আর আহাদের অর্থ হলো খোদার একা হওয়া বা একক হওয়া। আর আহাদের বিপরীতে অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বের কথা ধারণাই করা যেতে পারে না। অতএব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে বলেছেন যে, প্রকৃত তৌহীদ তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন আমরা আহাদীয়াতের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম বুঝব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আছে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় প্রকৃত তৌহীদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজ ভূমিকা রাখতে পারি।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (13th March 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B